অধ্যায় ৯ ঃ *জীবনস্মৃতি* — ২

অধ্যায় বিন্যাস

৯.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

৯.২ পরিচিতি

৯.৩ ভানুসিংহের কবিতা — মূল পাঠ

৯.৩.১ পাঠ বিশ্লেষণ

৯.৪ স্বাদেশিকতা — মূল পাঠ

৯.৪.১ পাঠ বিশ্লেষণ

৯.৫ মৃত্যুশোক — মূল পাঠ

৯.৫.১ পাঠ বিশ্লেষণ

৯.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ

৯.৭ অতিরিক্ত পঠন

৯.৮ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর

৯.৯ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৯.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি অধ্যয়ন করে আপনারা—

- কবিতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ সৃষ্টির পরিচয়
- প্রাচীন কবিতা উদ্ধারের বাসনা
- ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে দেশীয় গীতিকাব্যের তুলনা নিয়ে আলোচনা করা যায়
- রবীন্দ্রনাথের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের জাগরণ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে
- স্বদেশীভাবনায় হিন্দু মেলার উপযোগিতা নিয়ে বিশ্লেষণ করা যায়
- ভারতবর্ষের সার্বজনীন ভাবনা রক্ষার ক্ষেত্রে জ্যোতিদাদার নতুন পদক্ষেপ
- স্বদেশের উন্নতির জন্য রবীন্দ্রনাথের পরিবারের উদ্যোগ দিয়াশালাইয়ের কারখানা, কাপড়ের কল ইত্যাদি তৈরির প্রচেষ্টা নিয়ে আলোচনা
- রবীন্দ্রনাথের পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের গভীর উপলব্ধির পরিচয়
- মৃত্যুলোকের মাধ্যমে লেখকের দার্শনিক মনোভাবের বিকাশ
- রবীন্দ্রনাথেৰ মধ্যে শোকের থেকে বৈরাগ্য ভাবের উদয় নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

৯.২ পরিচিতি

বর্তমান অধ্যায়ে *জীবনস্মৃতি* গ্রন্থের 'ভানু সিংহের কবিতা', 'স্বদেশিকতা' এবং 'মৃত্যুশোক' সম্পর্কে অধ্যয়ণ করবেন। এই তিনটি রচনা অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ তার কবিতার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি, স্বদেশ প্রেম এবং মৃত্যুশোক মাধ্যমে জীবনকে কী ভাবে নতুন করে দেখেছেন তার পরিচয় দিয়েছেন।

৯.৩ ভানুসিংহের কবিতা — মূল পাঠ

পূর্বেই লিখিয়াছি, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র মহাশয় কর্তৃক সংকলিত প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত পড়িতাম। তাহার মৈথিলীমিশ্রিত ভাষা আমার পক্ষে দুর্বোধ ছিল। কিন্তু সেইজন্যই এত অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমি তাহার মধ্যে প্রবেশচেষ্টা করিয়াছিলাম। গাছের বীজের মধ্যে যে-অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন ও মাটির নীচে যে- রহস্য অনাবিষ্কৃত, তাহার প্রতি যেমন একটি একান্ত কৌতূহল বোধ করিতাম, প্রাচীন পদকর্তাদের রচনা সম্বন্ধেও আমরা ঠিক সেই ভাবটা ছিল। আবরণ মোচন করিতে করিতে একটি অপরিচিত ভাণ্ডার হইতে একটি-আধটি কাব্যরত্ন চোখে পড়িতে থাকিবে, এই আশাতেই আমাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই রহস্যের মধ্যে তলাইয়া দুর্গম অন্ধকার হইতে রত্ন তুলিয়া আনবার চেষ্টার যখন আছি তখন নিজেকেও একবার এইরূপ রহস্য-আবরণে আবৃত করিয়া প্রকাশ করিবার একটা ইচ্ছা আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল।

ইতিপূর্বে অক্ষয়বাবুর কাছে ইংরাজ বালককবি চ্যাটার্টনের বিবরণ শুনিয়াছিলাম। তাঁহার কাব্য যে কিরূপ তাহা জানিতাম না; বোধ করি অক্ষয়বাবুও বিশেষ কিছু জানিতেন না, এবং জানিলে বোধ হয় রসভঙ্গ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাঁহার গল্পটার মধ্যে যে একটা নাটকিয়ানা ছিল সে আমার কল্পনাকে খুব সরগরম করিয়া তুলিয়াছিল। চ্যাটার্টন প্রাচীন কবিদের এমন নকল করিয়া কবিতা লিখিয়াছিলেন যে অনেকেই তাহা ধরিতে পারে নাই। অবশেষে ষোলোবছর বয়সে এই হতভাগ্য বালক কবি আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছিলেন। আপাতত ওই আত্মহত্যার অনাবশ্যক অংশটুকু হাতে রাখিয়া, কোমর বাঁধিয়া দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম।

একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলাদিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা স্লেট লইয়া লিখিলাম 'গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে'। লিখিয়া ভারি খুশি হইলাম; তখনই এমন লোককে পড়িয়া শুনাইলাম বুঝিতে পারিবার আশঙ্কা-মাত্র যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং সে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল, "বেশ তো, এ তো বেশ হইয়াছে।"

পূর্বলিখিত আমার বন্ধুটিকে একদিন বলিলাম, "সমাজের লাইব্রেরি খুঁজিতে খুঁজিতে বহুকালের একটি জীর্ণ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে ভানুসিংহ-নামক কোনো প্রাচীন কবির

পদ কাপি করিয়া আনিয়াছি।" এই বলিয়া তাঁহাকে কবিতাগুলি শুনাইলাম। শুনিয়া তিনি বিষম বিচলিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "এ পুঁথি আমার নিতান্তই চাই। এমন কবিতা বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের হাত দিয়াও বাহির হইতে পারিত না। আমি প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ ছাপিবার জন্য ইহা অক্ষয়বাবুকে দিব।"

তখন আমার খাতা দেখাইয়া স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দিলাম, এ লেখা বিদ্যাপতি চণ্ডিদাসের হাত দিয়া নিশ্চয় বাহির হইতে পারে না, কারণ এ আমার লেখা। বন্ধু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "নিতান্ত মন্দ হয় নাই।"

ভানুসিংহ যখন ভারতীতে বাহির হইতেছিল ডাক্টার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন জর্মনিতে ছিলেন। তিনি য়ুরোপীয় সাহিত্যের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের দেশের গীতিকাব্য সম্বন্ধে একখানি চটি-বই লিখিয়াছিলেন। তাহাতে ভানুসিংহকে তিনি প্রাচীন পদকর্তারূপে যে প্রচুর সম্মান দিয়াছিলেন কোনো আধুনিক কবির ভাগ্যে তাহা সহজে জোটে না। এই গ্রন্থখানি লিখিয়া তিনি ডাক্টার উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

ভানুসিংহ যিনিই হউন, তাঁহার লেখা যদি বর্তমান আমার হাতে পড়িত তবে আমি নিশ্চয়ই ঠকিতাম না, এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। উহার ভাষা প্রাচীন পদকর্তার বলিয়া চালাইয়া দেওয়া অসম্ভব ছিল না। কারণ, এ ভাষা তাঁহাদের মাতৃভাষা নহে, ইহা একটা কৃত্রিম ভাষা; ভিন্ন ভিন্ন কবির হাতে ইহার কিছু না কিছু ভিন্নতা ঘটিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের ভাবের মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না। ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কষিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে। তাহাতে আমাদের দিশি নহবতের প্রাণ-গলানো ঢালা সুর নাই, তাহা আজকালকার সস্তা আর্গিনের বিলাতি টুংটাং মাত্র।

৯.৩.১ পাঠ বিশ্লেষণ

কবিতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ সৃষ্টির পরিচয় আমরা আলোচ্য প্রবন্ধে লক্ষ্য করি। ঠাকুরবাড়িতে কাব্য সাহিত্য নিয়ে আলোচনা চলত এবং রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন প্রাচীন কবিদের লেখার মধ্যে মৈথিলী মিশ্রিত ভাষার সংযোজন থাকত বলে তা সাধারণের পক্ষে দুর্বোধ্য হতো। রবীন্দ্রনাথকে এই দুর্বোধ্যতা ভীষণভাবে আকর্ষণ করেছিল, এরপর তিনি নিজে এইরূপ রহস্যের আবরণে আবৃত হয়ে কবিতা প্রকাশে প্রবৃত্ত হলেন। কিছুদিন পূর্বে অক্ষয়বাবু এই প্রাচীন কবিতা সংকলণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তিনি চ্যাটার্টন নামক এক বালক কবির কথা বলেছিলেন। তিনি প্রাচীন কবিদের এমন ভাবে নকল করতেন কেউ তা বুঝতে পারতেন না। অবশেষে মাত্র ষোলবছর বয়সে হতভাগ্য এই কবি আত্মহত্যা করে মারা যান। রবীন্দ্রনাথ এক মেঘাচ্ছন্ন দিনে প্রাচীন কবিদের অনুসরণে এক আলো-আধারি কবিতা তাঁর এক বন্ধুকে শোনালেন। বন্ধু হয়তো ঠিকমতে বিচার না করেই খুব ভালো হয়েছে বলে জানিয়ে দেন, বলেন- "বেশ তো,

এতো বেশ হইয়াছে।" এরপর ছাপানোর জন্য জোর দেন। বলেন সেইধরণের পুথি তিনি চান। তার লেখা এমন কবিতা চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির হাত দিয়েও হয়ত বেড় হতে পারত না। তিনি কাব্যগুলো ছাপানোর জন্য অক্ষয়কুমারকে দিতে চাইলেন এমনকি সে সময় ড° নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করে ভারতীয় গীতিকাব্যের সম্পর্ক নিয়ে একটি বই লিখে ডাক্টার উপাধিও পেয়েছিলেন। এবং ভানুসিংহকে প্রচুর সম্মান দিয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন যে তাঁর কবিতাগুলোতে দিশি নহবতের প্রাণ গলানো সুর ছিল না, তাতে ছিল বিদেশি আর্গিনের সাধারণ সুর। প্রাচীন কবি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের মত সেখানে সাবলীলতা ছিল না সেখানে ছিল আধুনিক কালের নতুনভাবে তৈরী করা কিছু রীতি। কিন্তু তিনি এরই মাঝে প্রাচীন কবিদের লেখাকে যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গে দেখিয়েছেন।



আসুন, জেনে নিই...

ভানুসিংহের কবিতা ঃ প্রাচীন কবিদের অনুসরণে রবীন্দ্রনাথের ছদ্মনামে লেখা কবিতা।

ভারতী ঃ ১২৮৪ তে প্রকাশিত হয় *ভারতী* পত্রিকাটি। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত লেখা *ভারতী*তে প্রকাশ পেত।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার ঃ প্রাচীন কাব্য সংকলন কর্তা।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ঃ প্রাচীন বিখ্যাত পদকর্তা তাদের লেখার মধ্যে মৈথিলী মিশ্রীত ভাষার সংযোজন থাকত যা সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হতো।

অগ্রগতি নির্ধায়ক প্রশ্ন



প্রশ্ন নং ১ ঃ লেখক কার কাব্যসংগ্রহ আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন?

.....

প্রশ্ন নং ২ ঃ মেঘাচ্ছন্ন এক দুপুরে রবীন্দ্রনাথ স্লেটে যে কবিতার অংশটি লিখেছিলেন তা কী ছিল?

.....

প্রশ্ন নং ৩ ঃ ইংরেজদের বালক কবির নাম কী ছিল যিনি প্রাচীন কবিদের অনুসরণে সুন্দর কবিতা লিখতেন?

.....

প্রশ্ন নং ৪ ঃ বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের দুজন বিখ্যাত পদকর্তার নাম লেখা?

.....

প্রশ্ন নং ৫ ঃ ভানুসিংহের কবিতাগুলো কোন প্রত্রিকায় প্রকাশিত হত?

.....

৯.৪ স্বাদেশিকতা — মূল পাঠ

বাহিরে হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশীপ্রথার চলন ছিল কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবর যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুন্ন ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তুত, সে-সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয়। তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নতুন আত্মীয় ইংরাজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্র লেখকের নিকটে তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল।

আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্ট হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার কর্মকর্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদা সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সংগীত 'মিলে সবে ভারতসন্তান' রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।

লর্ড কর্জনের সময় দিল্লিদরবার সম্বন্ধে একটা গদ্যপ্রবন্ধ লিখিয়াছি, লর্ড লিটনের সময় লিখিয়াছিলাম পদ্যে — তখনকার ইংরেজ গবর্মেন্ট রসিয়াকেই ভয় করিত, কিন্তু চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সের বালক কবির লেখনীকে ভয় করিত না। এইজন্য সেই কাব্যে বয়সোচিত উত্তেজনা প্রভূত পরিমাণে থাকা সত্বেও তখনকার প্রধান সেনাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিসের কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত কেহ কিছুমাত্র বিচলিত হইবার লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই। *টাইম্‌স্* পত্রেও কোনো পত্রলেখক এই বালকের ধৃষ্টতার প্রতি শাসন-কর্তাদের ঔদাসীন্যের উল্লেখ করিয়া বৃটিশ রাজত্বের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে গভীর নৈরাশ্য প্রকাশ করিয়া অত্যুষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করেন নাই। সেটা পড়িয়াছিলাম হিন্দুমেলায় গাছের তলায় দাঁড়াইয়া। শ্রোতাদের মধ্যে নবীন সেন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। আমার বড়ো বয়সে তিনি একদিন এ কথা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

জ্যোতিদাদার উদ্‌যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল, বৃদ্ধ রাজনারায়ণবাবু ছিলেন তাহার সভাপতি। ইহা স্বাদেশিকের সভা। কলিকাতার এক গলির মধ্যে এক পোড়ো বাড়িতে সেই সভা বসিত। সেই সভার সমস্ত অনুষ্ঠান রহস্যে আবৃত ছিল। বস্তুত, তাহার মধ্যে ওই গোপনীয়তাটাই একমাত্র ভয়ংকর ছিল। আমাদের ব্যবহারে রাজার বা প্রজার ভয়ের বিষয় কিছুই ছিল না। আমরা মধ্যাহ্নে কোথায় কী করিতে যাইতেছি, তাহা আমাদের আত্মীয়রাও জানিতেন না। দ্বার আমাদের রুদ্ধ, ঘর আমাদের অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের ঋক্‌মন্ত্রে, কথা আমাদের চুপিচুপি— ইহাতেই সকলের রোমহর্ষণ হইত, আর বেশি-কিছুই প্রয়োজন ছিল না। আমার মতো অর্বাচীনও এই সভার সভ্য ছিল। সেই সভায় আমরা এমন একটি খ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম যে, অহরহ উৎসাহে যেন আমরা উড়িয়া চলিতাম। লজ্জা ভয় সংকোচ আমাদের কিছুই ছিল না। এই

সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনার আগুন পোহানো। বীরত্ব জিনিসটা কোথাও-বা সুবিধাকর কোথাও-বা অসুবিধাকর হইতেও পারে, কিন্তু ওটার প্রতি মানুষের একটা গভীর শ্রদ্ধা আছে। সেই শ্রদ্ধাকে জাগাইয়া রাখিবার জন্য সকল দেশের সাহিত্যেই প্রচুর আয়োজন দেখিতে পাই। কাজেই যে-অবস্থাতেই মানুষ থাক্-না, মনের মধ্যে ইহার ধাক্কা না লাগিয়া তো নিষ্কৃতি নাই। আমরা সভা করিয়া, কল্পনা করিয়া, বাক্যালাপ করিয়া, গান গাহিয়া, সেই ধাক্কাটা সামলাইবার চেষ্টা করিয়াছি। মানুষের যাহা প্রকৃতিগত এবং মানুষের কাছে যাহা চিরদিন আদরণীয়, তাহার সকলপ্রকার রাস্তা মারিয়া, তাহার সকলপ্রকার ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিলে একটা যে বিষম বিকারের সৃষ্টি করা হয় সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকিতে পারে না। একটা বৃহৎ রাজ্যব্যবস্থার মধ্যে কেবল কেরানিগিরির রাস্তা খোলা রাখিলে মানবচরিত্রের বিচিত্র শক্তিকে তাহার স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর চালনার ক্ষেত্র দেওয়া হয় না। রাজ্যের মধ্যে বীরধর্মেরও পথ রাখা চাই, নহিলে মানবধর্মকে পীড়া দেওয়া হয়। তাহার অভাবে কেবলই গুপ্ত উত্তেজনা অন্তঃশীলা হইয়া বহিতে থাকে— সেখানে তাহার গতি অত্যন্ত অদ্ভুত এবং পরিণাম অভাবনীয়। আমার বিশ্বাস সেকালে যদি গবর্মেন্টের সন্দিগ্ধতা অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিত তবে তখন আমাদের সেই সভার বালকেরা যে বীরত্বের প্রহসনমাত্র অভিনয় করিতেছিল, তাহা কঠোরর ট্রাজেডিতে পরিণত হইতে পারিত। অভিনয় সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে, ফোর্ট উইলিয়মের একটি ইষ্টকও খসে নাই এবং সেই পূর্বস্মৃতির আলোচনা করিয়া আজ আমরা হাসিতেছি।

ভারতবর্ষের একটা সর্বজনীন পরিচ্ছদ কী হইতে পারে, এই সভায় জ্যোতিদাদা তাহার নানাপ্রকারের নমুনা উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ধুতিটা কর্মক্ষেত্রের উপযোগী নহে অথচ পায়জামাটা বিজাতীয়, এইজন্য তিনি এমন একটা আপস করিবার চেষ্টা করিলেন যেটাতে ধুতিও ক্ষুন্ন হইল, পায়জামাও প্রসন্ন হইল না। অর্থাৎ, তিনি পায়জামার উপর উপর একখণ্ড কাপড় পাট করিয়া একটা স্বতন্ত্র কৃত্রিম মালকোঁচা জুড়িয়া দিলেন। সোলার টুপির সঙ্গে পাগড়ির সঙ্গে মিশাল করিয়া এমন একটা পদার্থ তৈরি হইল যেটাকে অত্যন্ত উৎসাহী লোকেও শিরোভূষণ বলিয়া গণ্য করিতে পারে না। এইরূপ সর্বজনীন পোশাকের নমুনা সর্বজনে গ্রহণ করিবার পূর্বেই একলা নিজে ব্যবহার করিতে পারা যে-সে লোকের সাধ্য নহে। জ্যোতিদাদা অম্লানবদনে এই কাপড় পরিয়া মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে গাড়িতে গিয়া উঠিতেন— আত্মীয় এবং বান্ধব, দ্বারী এবং সারথি সকলেই অবাক হইয়া তাকাইত, তিনি ভ্রূক্ষেপ মাত্র করিতেন না। দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারে এমন বীরপুরুষ অনেক থাকিতে পারে কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য সর্বজনীন পোশাক পরিয়া গাড়ি করিয়া কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে পারে এমন লোক নিশ্চয় বিরল।

রবিবারে রবিবারে জ্যোতিদাদা দলবল লইয়া শিকার করিতে বাহির হইতেন। রবাহুত অনাহুত যাহারা আমাদের দলে আসিয়া জুটিত তাহাদের অধিকাংশকেই আমরা চিনিতাম না। তাহাদের মধ্যে ছুতার কামার প্রভৃতি সকল শ্রেণীরই লোক ছিল। এই শিকারে রক্তপাতটাই সব চেয়ে নগণ্য ছিল, অন্তত সেরূপ ঘটনা আমার তো মনে পড়ে না। শিকারের অন্য সমস্ত অনুষ্ঠানই বেশ ভরপুরমাত্রায় ছিল— আমরা হত-আহত পশু-পক্ষীর অতিতুচ্ছ অভাব কিছুমাত্র অনুভব

করিতাম না। প্রাতঃকালেই বাহির হইতাম। বউঠাকুরানী রাশীকৃত লুচি তরকারি প্রস্তুত করিয়া আমাদের সঙ্গে দিতেন। ওই জিনিসটাকে শিকার করিয়া সংগ্রহ করিতে হইত না বলিয়াই, একদিনও আমাদিগকে উপবাস করিতে হয় নাই।

মানিকতলায় পোড়োবাগানের অভাব নাই। আমরা যে-কোনো একটা বাগানে ঢুকিয়া পড়িতাম। পুকুরের বাঁধানো ঘাটে বসিয়া উচ্চনীচনির্বিচারে সকলে একত্র মিলিয়া লুচির উপরে পড়িয়া মুহূর্তের মধ্যে কেবল পাত্রটাকে মাত্র বাকি রাখিতাম।

ব্রজবাবুও আমাদের অহিংস্রক শিকারিদের মধ্যে একজন প্রধান উৎসাহী। ইনি মেট্রোপলিটন কলেজের সুপারিন্টেণ্ডন্ট্ এবং কিছুকাল আমাদের ঘরের শিক্ষক ছিলেন। ইনি একদিন শিকার হইতে ফিরিবার পথে একটা বাগানে ঢুকিয়াই মালীকে ডাকিয়া কহিলনে, "ওরে ইতিমধ্যে মামা কি বাগানে আসিয়াছিলেন।" মালী তাঁহাকে শশব্যস্ত হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "আজ্ঞা না, বাবু তো আসে নাই।" ব্রজবাবু কহিলেন, "আচ্ছা, ডাব পাড়িয়া আন্।" সেদিন লুচির অন্তে পানীয়ের অভাব হয় নাই।

আমাদের দলের মধ্যে একটি মধ্যবিত্ত জমিদার ছিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু। তাঁহার গঙ্গার ধারে একটি বাগান ছিল। সেখানে গিয়া আমরা সকল সভ্য একদিন জাতিবর্ণনির্বিচারে আহার করিলাম। অপরাহ্নে বিষম ঝড়। সেই ঝড়ে আমরা গঙ্গার ঘাটে দাঁড়াইয়া চীৎকার শব্দে গান জুড়িয়া দিলাম। রাজনারায়ণবাবুর কণ্ঠে সাতটা সুর যে বেশ বিশুদ্ধভাবে খেলিত তাহা নহে কিন্তু তিনিও গলা ছাড়িয়া দিলেন, এবং সূত্রের চেয়ে ভাষ্য যেমন অনেক বেশি হয় তেমনি তাঁহার উৎসাহের তুমুল হাতনাড়া তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠেকে বহু দুরে ছাড়াইয়া গেল; তালের ঝোঁকে মাথা নাড়িতে লাগিলেন এবং তাঁহার পাকা দাড়ির মধ্যে ঝড়ের হাওয়া মাতামাতি করিতে লাগিল। অনেক রাত্রে গাড়ি করিয়া বাড়ি ফিরিলাম। তখন ঝড়বাদল থামিয়া তারা ফুটিয়াছে। অন্ধকার নিবিড়, আকাশ নিস্তব্ধ, পাড়াগাঁয়ের পথ নির্জন, কেবল দুই ধারের বনশ্রেণীর মধ্যে দলে দলে জোনাকি যেন নিঃশব্দে মুঠা মুঠা আগুনের হরির লুঠ ছড়াইতেছে।

স্বদেশে দিয়াশালাই প্রভৃতির কারখানা স্থাপন করা আমাদের সভার উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল। এজন্য সভ্যেরা তাঁহাদের আয়ের দশমাংশ এই সভায় দান করিতেন। দেশালাই তৈরি করিতে হইবে, তাহার কাঠি পাওয়া শক্ত। সকলেই জানেন, আমাদের দেশে উপযুক্ত হাতে খেংরাকাঠির মধ্য দিয়া সস্তায় প্রচুরপরিমাণে তেজ প্রকাশ পায় কিন্তু সে-তেজ যাহা জ্বলে তাহা দেশালাই নহে। অনেক পরীক্ষার পর বাক্সকয়েক দেশলাই তৈরি হইল। ভারতসন্তানদের উৎসাহের নিদর্শন বলিয়াই যে তাহারা মূল্যবান তাহা নহে—আমাদের এক বাক্সে যে-খরচ পড়িতে লাগিল তাহাতে একটা পল্লীর সম্বৎসরের চুলা-ধরানো চলিত। আরো একটু সামান্য অসুবিধা এই হইয়াছিল যে, নিকটে অগ্নিশিখা না থাকিলে তাহাদিগকে জ্বালাইয়া তোলা সহজ ছিল না। দেশের প্রতি জ্বলন্ত অনুরাগ যদি তাহাদের জ্বলনশীলতা বাড়াইতে পারিত, তবে আজ পর্যন্ত তাহারা বাজারে চলিত।

খবর পাওয়া গেল, একটি কোনো অল্পবয়স্ক ছাত্র কাপড়ের কল তৈরি করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত; গেলাম তাহার কল দেখিতে। সেটা কোনো কাজের জিনিস হইতেছে কি না তাহা কিছুমাত্র

বুঝিবার শক্তি আমাদের কাহারো ছিল না, কিন্তু বিশ্বাস করিবার ও আশা করিবার শক্তিতে আমরা কাহারো চেয়ে খাটো ছিলাম না। যন্ত্র তৈরি করিতে কিছু দেনা হইয়াছিল, আমরা তাহা শোধ করিয়া দিলাম। অবশেষে একদিন দেখি ব্রজবাবু মাথায় একখানা গামছা বাঁধিয়া জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত। কহিলেন, "আমাদের কলে এই গামছার টুকুরা তৈরি হইয়াছে।" বলিয়া দুই হাত তুলিয়া তাণ্ডব নৃত্যঙ্গ— তখন ব্রজবাবুর মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে।

অবশেষে দুটি-একটি সুবুদ্ধি লোক আসিয়া আমাদের দলে ভিড়িলেন, আমাদিগকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়াইলেন এবং এই স্বর্গলোক ভাঙিয়া গেল।

ছেলেবেলায় রাজনারায়ণবাবুর সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় ছিল তখন সকল দিক হইতে তাঁহাকে বুঝিবার শক্তি আমাদের ছিল না। তাঁহার মধ্যে নানা বৈপরীত্যের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তখনই তাঁহার চুলদাড়ি প্রায় সম্পূর্ণ পাকিয়াছে কিন্তু আমাদের দলের মধ্যে বয়সে সকলের চেয়ে যে-ব্যক্তি ছোটো তাহার সঙ্গেও তাঁহার বয়সের কোনো অনৈক্য ছিল না। তাঁহার বাহিরের প্রবীণতা শুভ্র মোড়কটির মতো হইয়া তাঁহার অন্তরের নবীনতাকে চিরদিন তাজা করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। এমন-কি প্রচুর পাণ্ডিত্যেও তাঁহার কোনো ক্ষতি করিতে পারে নাই, তিনি একেবারেই সহজ মানুষটির মতোই ছিলেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত অজস্র হাস্যোচ্ছ্বাস কোনো বাধাই মানিল না — না বয়সের গাম্ভীর্য, না অস্বাস্থ্য, না সংসারের দুঃখকষ্ট, ন মেধয়া ন বহু না শ্রুতেন, কিছুতেই তাঁহার হাসির বেগকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। একদিন তিনি আপনার জীবন এবং সংসারটিকে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন, আর-একদিকে দেশের উন্নতিসাধন করিবার জন্য তিনি সর্বদাই কতরকম সাধ্য ও অসাধ্য প্ল্যান করিতেন তাহার আর অন্ত নাই। রিচার্ডসনের তিনি প্রিয় ছাত্র, ইংরেজি বিদ্যাতেই বাল্যকাল হইতে তিনি মানুষ কিন্তু তবু অনভ্যাসের সমস্ত বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া বাংলাভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে পূর্ণ উৎসাহ ও শ্রদ্ধার বেগে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন। এদিকে তিনি মাটির মানুষ কিন্তু তেজে একেবারে পরিপূর্ণ ছিলেন। দেশের প্রতি তাঁহার যে প্রবল অনরাগ সে তাঁহার সেই তেজের জিনিস। দেশের সমস্ত খর্বতা দীনতা অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন। তাঁহার দুই চক্ষু জ্বলিতে থাকিতে, তাঁহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত, উৎসাহের সঙ্গে হাত নাড়িয়া আমাদের সঙ্গে মিলিয়া তিনি গান ধরিতেন— গলায় সুর লাগুক আর না লাগুক সে তিনি খেয়ালই করিতেন না—

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।

এই ভগবদ্‌ভক্ত চিরবালকটির তেজঃপ্রদীপ্ত হাস্যমধুর জীবন রোগে শোকে অপরিম্লান তাঁহার পবিত্র নবীনতা, আমাদের দেশের স্মৃতিভাণ্ডারে সমাদরের সহিত রক্ষা করিবার সামগ্রী তাহাতে সন্দেহ নাই।

৯.৪.১ পাঠ বিশ্লেষণ

ইংরেজ শাসিত ভারতীয় সমাজে রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে বিদেশি সংস্কৃতির সঙ্গে

পরিচয় হলেও স্বদেশি ভাবনাকে তার পিতা এবং দাদা কেউই কখনো ভুলে যায়নি। ঠাকুরবাড়ির উদ্যোগে আয়োজিত "হিন্দুমেলা" তাদের স্বাদেশিকতাবোধের পরিচয় বহন করে। এই মেলায় রবীন্দ্রনাথের মেজ দাদা সেই সময়ের বিখ্যাত জাতীয় সংগীত 'মিলে সবে ভারতসন্তান' রচনা করেছিলেন। এই মেলায় স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত হত ও দেশী গুণী লোককে পুরস্কৃত হত। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এই স্বদেশিভাবনা খুব স্বাভাবিকভাবে প্রভাব সৃষ্টি করেছে। স্বদেশি ভাবনাকে জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে এই মেলায় স্বদেশি কবিতা পাঠ ইত্যাদি হতো। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যগে 'স্বদেশিকতার সভা' নামক যে গুপ্ত সভায় দেশপ্রেমের চর্চা শুরু হয়েছিল, সেখানে রবীন্দ্রনাথের মত বর্ণনার খুব উৎসাহের সঙ্গে ব্যক্ত করেছিল। বৃটিশদের তাড়াতে না পারলেও এই সভা তরুণদের স্বদেশিভাবনায় ভীষণভাবে উত্তেজিত করতে সক্ষম হয়েছে। এমনকী এই সভাকে কেন্দ্র করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দেশের সার্বজনীণ দেশীয় আদর্শে চিহ্নিত পোশাকের যে ছাপ রেখেছেন, তাও দেশপ্রেমের আদর্শকে বহন করে। ভারতবর্ষের সার্বজনীন পরিচ্ছদকে প্রকাশ করতে জ্যোতিদাদা কর্মক্ষেত্রে ধুতি উপযোগী নয় এবং পায়জামা বিজাতীয়, তাই এমন একটা আপোস করে পোষাক পড়লেন যেখানে পায়জামার উপর একপ্রস্ত কাপড় পাট করে স্বতন্ত্র কৃত্রিম মালকোঁচা জুড়ে দিলেন। সোনার টুপির সঙ্গে পাগড়ি মিলিয়ে দিলেন। দেশলাই তৈরীর উদ্যোগ, নিজেদের কাপড়ের কলে স্বদেশি কাপড় উৎপাদনের প্রচেষ্টা এসব কিছুতে তখন সমাজের স্বদেশিকতা বোধের যে উজ্বল চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা সর্বকালের দেশ প্রেমের আদর্শ।

রবিবারে জ্যোতিদাদা দলবল সহ শিকারে বের হতেন। বরাহুত অনাহুত অনেকে এসে তাদের যোগ দিতেন। এই শিকারে রক্তপাত হতোনা কিন্তু অন্য অনুষ্ঠান বেশ ভালোভাবেই হতো। পশু পাখির অভাব ও অনুভব করতেন না। ভোরে বেড় হতেন বলে বৌঠাকুরাণী তাদের জন্য লুচি তরকারি প্রস্তুত করে দিতেন।

শেষে রাজনারায়ণ বসু সম্পর্কে। তিনি বলেন রাজনারায়ণ বসু স্বাদেশি সভায় খুব সক্রিয় চরিত্র হিচাবে ছিলেন। তাঁর বয়স বেড়ে গেলেও ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে মিলতেন। তার বাইরের দিকের প্রবীণতা তার অন্তরের নবীনতাকে চিরদিন জাগিয়ে রেখেছে। এমনকি পাণ্ডিত্যও তাকে কোনো ক্ষতি করেনি। না বয়সের গম্ভীর্য, না অস্বাস্থ্য, না সংসারের দুখ কষ্ট, কিছুতেই তার হাসির আবেগ ঠকানো যেত না। তিনি নিজের জীবন দেশের উন্নতির কাজে হাসি মুখে লাগিয়ে ঈশ্বরকে তার জীবন সম্পর্ণ করে দিয়েছিল এবং সুর লাগুক না লাগুক তিনি আপন মনে গান গেয়ে চলতেন।



আসুন, জেনে নিই...

হিন্দুমেলা ঃ ১৮৬৭ সালে নবগোপাল মিত্রের অধীনে জনসাধারণের মধ্যে স্বাদেশিকতা জাগিয়ে তুলতে এক মেলার আয়োজন করা

হয়েছিল, যেখানে দেশীয় কবিতা, গান, খেলা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হতো।

লর্ড কার্জন ও লর্ড লিটন ঃ এরা ব্রিটিশ শাসক ছিলেন।

ঋক্‌মন্ত্র ঃ *ঋক্‌বেদের* মন্ত্র, 'ঋক' শব্দের অর্থ হচ্ছে সত্য। সত্যকে জানা বা সত্যজ্ঞানই হচ্ছে এর মূলকথা।

মেজদাদা ঃ রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ফোর্ট উইলিয়াম ঃ বৃটিশ সরকার দ্বারা কলকাতার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত দুর্গ ও কলেজ, মূলত শাসনকার্য পরিচালনা করা ও ইংরেজ কর্মচারীদের দেশীয় শিক্ষা প্রসারের জন্য ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে এই দুর্গ ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

মালকোঁচা ঃ মল্লের মতো পরিহিত কাপড়ের কোঁচাকে টেনে পেছনে লাঁজা।

রিচার্ডসন ঃ উনিশ শতকে হিন্দু কলেজের খ্রীষ্টান অধ্যাপক।



অগ্রগতি নির্ধায়ক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ৬ ঃ 'হিন্দুমেলার অন্যতম কর্মকর্তা কে ছিলেন?

.....

প্রশ্ন নং ৭ ঃ রবীন্দ্রনাথদের স্বাদেশিকর সভার সভাপতি কে ছিলেন?

.....

প্রশ্ন নং ৮ ঃ কার উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকের সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

.....

প্রশ্ন নং ৯ ঃ লেখকদের স্বাদেশিক সভা কোথায় বসত?

.....

প্রশ্ন নং ১০ ঃ সঞ্জীবনী সভার সাংকেতিক নাম কী ছিল?

.....

৯.৫ মৃত্যুশোক — মূল পাঠ

ইতিমধ্যে বাড়িতে পরে পরে কয়েকটি মৃত্যুঘটনা ঘটিল। ইতিপূর্বে মৃত্যুকে আমি কোনোদিন প্রতক্ষ্য করি নাই। মা'র যখন মৃত্যু হয় আমার তখন বয়স অল্প। অনেকদিন হইতে তিনি রোগে ভুগিতেছিলেন, কখন যে তাঁহার জীবনসংকট উপস্থিত হইয়াছিল তাহা জানিতেও পাই নাই। এতদিন পর্যন্ত যে-ঘরে আমরা শুইতাম সেই ঘরেই স্বতন্ত্র শয্যায় মা শুইতেন। কিন্তু, তাঁহার রোগের সময় একবার কিছুদিন তাঁহাকে বোটে করিয়া গঙ্গায় বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হয়— তাঁহার পরে বাড়িতে ফিরিয়া তিনি অন্তঃপুরের তেতালার ঘরে থাকিতেন। যে-রাত্রিতে তাঁহার মৃত্যু হয় আমরা তখন ঘুমাইতেছিলাম, তখন কত রাত্রি জানি না, একজন পুরাতন দাসী

আমাদের ঘরে ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ওরে তোদের কী সর্বনাশ হল রে" তখনই বউঠাকুরাণী তাড়াতাড়ি তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেলেন— পাছে গভীর রাত্রে আচমকা আমাদের মনে গুরুতর আঘাত লাগে এই আশঙ্কা তাঁহার ছিল। স্তিমিত প্রদীপে, অস্পষ্ট আলোকে ক্ষণকালের জন্য জাগিয়া উঠিয়া হঠাৎ বুকটা দমিয়া গেল, কিন্তু কী হইয়াছে ভালো করিয়া বুঝিতেই পারিলাম না। প্রভাতে উঠিয়া যখন মা'র মৃত্যুসংবাদ শুনিলাম তখনো সে-কথাটার অর্থ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম, তাঁহার সুসজ্জিত দেহ প্রাঙ্গণে খাটের উপরে শয়ান। কিন্তু, মৃত্যু যে ভয়ংকর সে-দেহে তাহার কোনো প্রমাণ ছিল না; সেদিন প্রভাতের আলোকে মৃত্যুর যে-রূপ দেখিলাম তাহা সুখসুপ্তির মতোই প্রশান্ত ও মনোহর। জীবন হইতে জীবনান্তের বিচ্ছেদ স্পষ্ট করিয়া চোখে পড়িল না। কেবল যখন তাঁহার দেহ বহন করিয়া বাড়ির সদর-দরজার বাহিরে লইয়া গেল এবং আমরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্মশানে চলিলাম তখনই শোকের সমস্ত ঝড় যেন একেবারে এক দমকায় আসিয়া মনের ভিতরটাতে এই একটা হাহাকার তুলিয়া দিল যে, এই বাড়ির এই দরজা দিয়া মা আর-একদিনও তাঁহার নিজের এই চিরজীবনের ঘরকরনার মধ্যে আপনার আসনটিতে আসিয়া বসিবেন না। বেলা হইল, শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিলাম; গলির মোড়ে আসিয়া তেতালায় পিতার ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম— তিনি তখনো তাঁহার ঘরের সম্মুখের বারান্দায় স্তব্ধ হইয়া উপাসনায় বসিয়া আছেন।

বাড়িতে যিনি কনিষ্ঠা বধু ছিলেন তিনিই মাতৃহীন বালকদের ভার লইলেন। তিনিই আমাদিগকে খাওয়াইয়া পরাইয়া সর্বদা কাছে টানিয়া, আমাদের যে কোনো অভাব ঘটিয়াছে তাহা ভুলাইয়া রাখিবার জন্য দিনরাত্রি চেষ্টা করিলেন। যে-ক্ষতি পূরণ হইবে না, যে-বিচ্ছেদের প্রতিকার নাই, তাহাকে ভুলিবার শক্তি প্রাণশক্তির একটা প্রধান অঙ্গ; শিশুকালে সেই প্রাণশক্তি নবীন ও প্রবল থাকে, তখন সে কোনো আঘাতকে গভীরভাবে গ্রহণ করে না, স্থায়ী রেখায় আঁকিয়া রাখে না। এইজন্য জীবনে প্রথম যে-মৃত্যু কালো ছায়া ফেলিয়া প্রবেশ করিল তাহা আপনার কালিমাকে চিরন্তন না করিয়া ছায়ার মতোই একদিন নিঃশব্দপদে চলিয়া গেল। ইহার পরে বড়ো হইল যখন বসন্তপ্রভাতে একমুঠা অনতিস্ফুট মোটা বেলফুল চাদরের প্রান্তে বাঁধিয়া খ্যাপার মতো বেড়াইতাম, তখন সেই কোমল চিক্কণ কুঁড়িগুলি ললাটের উপর বুলাইয়া প্রতিদিনাই আমার মায়ের শুভ্র আঙুলগুলি মনে পড়িত; আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতাম, যে-স্পর্শ সেই সুন্দর আঙুলের আগায় ছিল সেই স্পর্শই প্রতিদিন এই বেলফুলগুলির মধ্যে নির্মল হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে; জগতে তাহার আর অন্ত নাই, তা আমরা ভুলিই আর মনে রাখি।

কিন্তু, আমার চব্বিশবছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে-পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে। শিশুবয়সের লঘু জীবন বড়ো বড়ো মৃত্যুকেও অনায়াসেই পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া যায়, কিন্তু অধিক বয়সে মৃত্যুকে অত সহজে ফাঁকি দিয়া এড়াইয়া চলিবার পথ নাই। তাই সেদিনকার সমস্ত দুঃসহ আঘাত বুক পাতিয়া লইতে হইয়াছিল।

জীবনের মধ্যে কোথাও যে কিছুমাত্র ফাঁক আছে, তাহা তখন জানিতাম না; সমস্তই হাসিকান্নায় একেবারে নিরেট করিয়া বোনা। তাহাকে অতিক্রম করিয়া আর কিছুই দেখা যাইত না, তাই তাহাকে একেবারে চরম করিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম। এমন সময় কোথা হইতে মৃত্যু আসিয়া এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ জীবনটার একটা প্রান্ত যখন এক মুহূর্তের মধ্যে ফাঁক করিয়া দিল, তখন মনটার মধ্যে সে কী ধাঁধাই লাগিয়া গেল। চারি দিকে গাছপালা মাটিজল চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা তেমনি নিশ্চিত সত্যেরই মতো বিরাজ করিতেছে, অথচ তাহাদেরই মাঝখানে তাহাদেরই মতো যাহা নিশ্চিত সত্য ছিল, এমন-কি, দেহ প্রাণ হৃদয় মনের সহস্রবিধ স্পর্শের দ্বারা যাহাকে তাহাদের সকলের চেয়েই বেশি সত্য করিয়াই অনুভব করিতাম সেই নিকটের মানুষ যখন এত সহজে এক নিমিষে স্বপ্নের মতো মিলিইয়া গেল তখন সমস্ত জগতের দিকে চাহিয়া মনে হইতে লাগিল, এ কী অদ্ভুত আত্মখণ্ডনঙ্গ যাহা আছে এবং যাহা রহিল না, এই উভয়ের মধ্যে কোনোমতে মিল করিব কেমন করিয়া।

জীবনের এই রন্ধ্রটির ভিতর দিয়া যে একটা অতলস্পর্শ অন্ধকার প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তাহাই আমাকে দিনরাত্রি আকর্ষণ করিতে লাগিল। আমি ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল সেইখানে আসিয়া দাঁড়াই, সেই অন্ধকারের দিকেই তাকাই এবং খুঁজিতে থাকি— যাহা গেলা তাহার পরিবর্তে কী আছে। শূন্যতাকে মানুষ কোনোমতেই অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করিতে পারে না। যাহা নাই তাহাই মিথ্যা, যাহা মিথ্যা তাহা নাই। এইজন্যই যাহা দেখিতেছি না তাহার মধ্যে দেখিবার চেষ্টা, যাহা পাইতেছি না তাহার মধ্যেই পাইবার সন্ধান কিছুতেই থামিতে চায় না। চারাগাছকে অন্ধকার বেড়ার মধ্যে ঘিরিয়া রাখিলে, তাহার সমস্ত চেষ্টা যেমন সেই অন্ধকারকে কোনোমতে ছাড়াইয়া আলোকে মাথা তুলিবার জন্য পদাঙ্গুলিতে ভর করিয়া যথাসম্ভব খাড়া হইয়া উঠিতে থাকে, তেমনি মৃত্যু যখন মনের চারি দিকে হঠাৎ একটা 'নাই'-অন্ধকারের বেড়া গাড়িয়া দিল, তখন সমস্ত মনপ্রাণ অহোরাত্র দুঃসাধ্য চেষ্টায় তাহারই ভিতর দিয়া কেবলই 'আছে'- আলোকের মধ্যে বাহির হইতে চাহিল। কিন্তু, সেই অন্ধকারকে অতিক্রম করিবার পথ অন্ধকারের মধ্যে যখন দেখা যায় না তখন তাহার মতো দুঃখ আর কী আছে।

তবু এই দুঃখের ভিতর দিয়া আমার মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে একটা আকস্মিক আনন্দের হাওয়া বহিতে লাগিল, তাহাতে আমি নিজেই আশ্চর্য হইতাম। জীবন যে একেবারে অবিচলিত নিশ্চিত নহে, এই দুঃখের সংবাদেই মনের ভার লঘু হইয়া গেল। আমরা যে নিশ্চল সত্যের পাথরে-গাঁথা দেয়ালের মধ্যে চিরদিনের কয়েদি নহি, এই চিন্তায় আমি ভিতরে ভিতরে উল্লাস বোধ করিতে লাগিলাম। যাহাকে ধরিয়াছিলাম তাহাকে ছাড়িতেই হইল, এইটাকে ক্ষতির দিক দিয়া দেখিয়া যেমন বেদনা পাইলাম তেমনি সেইক্ষণেই ইহাকে মুক্তির দিক দেখিয়া একটা উদার শান্তি বোধ করিলাম। সংসারের বিশ্বব্যাপী অতি বিপুল ভার জীবনমৃত্যুর হরণপূরণে আপনাকে আপনি সহজেই নিয়মিত করিয়া চারি দিকে কেবলই প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, সে-ভার বদ্ধ হইয়া কাহাকেও কোনোখানে চাপিয়া রাখিয়া দিবে না, একেশ্বর জীবনের দৌরাত্ম কাহাকেও বহন করিতে হইবে না, এই কথাটা একটা আশ্চর্য নতুন সত্যের মতো আমি সেদিন যেন প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলাম।

সেই বৈরাগ্যের ভিতর দিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য আরো গভীররূপে রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিছুদিনের জন্য জীবনের প্রতি আমার অন্ধ আসক্তি একেবারেই চলিয়া গিয়াছিল বলিয়াই, চারি দিকে আলোকিত নীল আকাশের মধ্যে গাছপালার আন্দোলন আমার অশ্রুধৌত চক্ষে ভাবি একটি মাধুরী বর্ষণ করিত। জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে- দূরত্বের প্রয়োজন, মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘটাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম, তাহা বড়ো মনোহর।

সেই সময়ে আবার কিছুকালের জন্য আমার একটা সৃষ্টিছাড়া রকমের মনের ভাব ও বাহিরের আচরণ দেখা দিয়াছিল। সংসারের লোকলৌকিকতাকে নিরতিশয় সত্য পদার্থের মতো মনে করিয়া তাহাকে সদাসর্বদা মানিয়া চলিতে আমার হাসি পাইত। সে-সমস্ত যেন আমার গায়েই ঠেকিত না। কে আমাকে কী মনে করিবে, কিছুদিন এ দায় আমার মনে একেবারেই ছিল না। ধূতির উপর গায়ে কেবল একটা মোটা চাদর এবং পায়ে একজোড়া চটি পরিয়া কতদিন থ্যাকারের বাড়িতে বই কিনিতে গিয়াছি। আহারের ব্যবস্থাটাও অনেক অংশে খাপছাড়া ছিল। কিছুকাল ধরিয়া আমার শয়ন ছিল বৃষ্টি বাদল শীতেও তেতালায় বাহিরের বারান্দায়; সেখানে আকাশের তারার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হইতে পারিত, এবং ভোরের আলোর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের বিলম্ব হইত না।

এ- সমস্ত যে বৈরাগ্যের কৃচ্ছসাধন, তাহা একেবারেই নহে। এ যেন আমার একটা ছুটির পালা; সংসারের বেত-হাতে গুরুমহাশয়কে যখন নিতান্ত একটা ফাঁকি বলিয়া মনে হইল, তখন পাঠশালার প্রত্যেক ছোটো ছোটো শাসনও এড়াইয়া মুক্তির আস্বাদনে প্রবৃত্ত হইলাম। একদিন সকালে ঘুম হইতে জাগিয়াই যদি দেখি পৃথিবীর ভারাকর্ষণটা একেবারে অর্ধেক কমিয়া গিয়াছে, তাহা হইল কি আর সরকারি রাস্তা বাহিয়া সাবধানে চলিত ইচ্ছা করে। নিশ্চয়ই তাহা হইলে হ্যারিসন রোডের চারতলা-পাঁচতলা বাড়িগুলা বিনা কারণেই লাফ দিয়া ডিঙাইয়া চলি এবং ময়দানে হাওয়া খাইবার সময় যদি সামনে অক্টরলনি মনুমেন্টটা আসিয়া পড়ে তাহা হইলে ওইটুকুখানি পাশ কাটাইতেও প্রবৃত্তি হয় না, ধাঁ করিয়া তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া পার হইয়া যাই। আমারও সেই দশা ঘটিয়াছিল; পায়ের নীচে হইতে জীবনের টান কমিয়া যাইতেই আমি বাঁধা রাস্তা একেবারে ছাড়িয়া দিবার জো করিয়াছিলাম।

বাড়ির ছাদে একলা গভীর অন্ধকারে মৃত্যুরাজ্যের কোনো-একটা চূড়ার উপরকার একটা ধ্বজপতাকা, তাহার কালো পাথরের তোরণদ্বারের উপরে আঁক পাড়া কোনো-একটা অক্ষর কিম্বা একটা চিহ্ন দেখিবার জন্য আমি যেন সমস্ত রাত্রিটার উপর অন্ধের মতো দুই হাত বুলাইয়া ফিরিতাম। আবার, সকাল বেলায় যখন আমার সেই বাহিরের পাতা বিছনার উপরে ভোরের আলো আসিয়া পড়িত তখন চোখ মেলিয়াই দেখিতাম, আমার মনের চারি দিকের আবরণ যেন স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে; কুয়াশা কাটিয়া গেলে পৃথিবীর নদী গিরি অরণ্য যেমন ঝলমল করিয়া ওঠে, জীবনলোকের প্রসারিত ছবিখানি আমার চোখে তেমনি শিশিরসিক্ত নবীন ও সুন্দর করিয়া দেখা দিয়াছে।

৯.৫.১ পাঠ বিশ্লেষণ

ঠাকুরবাড়িতে পর পর কয়েকটি মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ মানসিকভাবে অনেকটা শোকাহত হয়ে পড়েছিলেন। মৃত্যুর আগে রবীন্দ্রনাথের মা অনেকদিন ভুগছিলেন। তিনি লেখকদের সঙ্গে এক ঘরে শয়ণ করতেন, তাঁর রোগের সময় কিছুদিনের জন্য তাকে গোটা করে গঙ্গায় বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর থেকে তিনি অন্তঃপুরের তেতালয় থাকতেন, যে রাত্রিতে তিনি মারা যান, লেখকরা কেউ সামনে ছিলেন না। দাসী এসে খবর দেওয়া? তারা জানতে পারে। ছেলোবলায় মায়ের মৃত্যু হওয়ায় প্রথমত তিনি মৃত্যুকে বুঝে উঠতে পারেননি। মা চলে যাওয়ার পর বৌঠানরা মায়ের সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কিন্তু মাকে আর কোনোদিন ঘরকন্নার কাজে দেখতে পাবে না- এই ভেবে মায়ের শব যাত্রার সময় খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বেলফুলের কুঁড়িগুলো চাদরের প্রান্তে বেঁধে মায়ের স্নেহের ছোঁয়া অনুভব করতেন। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুকে আরো গভীরভাবে দেখতে ও বুঝতে শিখলেন। মৃত্যু যে কতটা শোকের, কতটা বিষাদময় এবং এরই মাঝে পৃথিবীর সজীবতা, সময়ের গতি চলমান জীবন বয়ে চলছে। মৃত্যু বা শোকাচ্ছন্ন পরিবেশ যখন চারদিক আবিষ্ট করে থাকে তখন তার একমাত্র পরিত্রাণ আলোর দিকে। অন্ধকারময় শোকাচ্ছন্ন জীবন চিরদিন থাকতে পারে না। মৃত্যুর পরই রয়েছে নতুন সৃষ্টি, নতুন জীবন — এধরনের আশাবাদী মনোভাব লেখকের মনে ধীরে ধীরে প্রবেশ করল। আপনজনদের মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে তার মধ্যে একসময় সংসারের প্রতি বৈরাগ্য জন্মেছিল, কিন্তু বিরাট মুক্তির স্বাদকে আস্বাদন করতে শেখায় তিনি মৃত্যুকে নতুনরূপে বুঝতে পারলেন। এক-একবার মৃত্যুর শোকে ভেঙে পড়লেও পরমুহূর্তে তিনি নতুন আশার আলোয় উঠে দাঁড়িয়েছেন।



আসুন, জেনে নিই...

রবীন্দ্রনাথের মা ঃ সারদাদেবী। রবীন্দ্রনাথের খুব কম বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

বৈরাগ্য ঃ যে ধর্ম সংসার ধর্মকে ত্যাগ করে। ভোগবিলাসহীন জীবনকে গ্রহণ করতে শেখায়।

থ্যাকার ঃ উইলিয়াম মেকপিস্ থ্যাকারের বিখ্যাত পুস্তক প্রতিষ্ঠান।

অক্টরলনি মনুমেন্ট ঃ ১৮২৮ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত স্যার অক্টরলণির স্মরণে যে শহীদ মিনার মেটাই অক্টরলনি মনুমেন্ট নামে নিহ্নিত। সালে স্বাধীনতা সংগ্রামে বলিদানকারী ভারতীয়দের স্মরাণ এই স্মৃতি সৌধটি উৎসর্গ করা হয়।



অগ্রগতি নির্ধায়ক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ১১ ঃ রবীন্দ্রনাথের মায়ের অসুখের সময় তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল?

.....

প্রশ্ন নং ১২ ঃ "ওরে তোদের কী সর্বনাশ হল রে।" — কে এই করুণ মন্তব্যটি এসে রবীন্দ্রনাথদের জানায়?

.....

প্রশ্ন নং ১৩ ঃ মাতৃহীনা বালকদের কে দেখাশোনা করতেন?

.....

প্রশ্ন নং ১৪ ঃ রবীন্দ্রনাথের মায়ের মৃত্যুর পর কিসের মধ্যে তিনি মায়ের ছোঁয়া অনুভব করতেন?

.....

প্রশ্ন নং ১৫ ঃ "আমার..... বয়সের সময় মৃত্যুরে সঙ্গে যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়।" (শূন্যস্থান পূর্ণ করো)

.....



৯.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ

- অজিতকুমার চক্রবর্তী বলেছিলেন যে, ভালো আত্মজীবনীর বিশেষত্বই এই যে, তা জীবনকে বাইরের কয়েকটা ঘটনার জড়সমষ্টির মধ্যে বন্দীর মতো করে দেয়া না, তা জীবনের অন্তরতম স্থানের একটি গভীর অভিপ্রায়ের সূত্রে বাইরের ঘটনাগুলোকে এমনিভাবে গেঁথে ফেলে, যাতে জীবনের সব বৈচিত্র্যই তাৎপর্যমণ্ডিত হয়।
- বর্তমান অধ্যায়র তিনিটা অংশ পড়ে রবীন্দ্র জীবনের সঙ্গে সমৃদ্ধ এই কথাগুলোই মনে পড়াবে আপনাদের।



৯.৭ অতিরিক্ত পঠন

১) চক্রবর্তী, অজিত কুমার; *কাব্যপরিক্রমা।*

২) দাস, শিশির কুমার; *আত্মজীবনী ঃ জীবনী ও রবীন্দ্রনাথ।*

৩) মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার; *রবীন্দ্র পরিক্রমা।*



৯.৮ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর

১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারও সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের সংকলিত কাব্যসংগ্রহ।

২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ 'গহন কুসুম-কুঞ্জ-মাঝে'।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ চ্যাটার্টনের।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ *ভারতী* পত্রিকায়।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ নবগোপাল মিত্র।

৭ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ রাজনারায়ণ বসু।

৮ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে।

৯ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ উত্তর কলকাতায় ঠনঠনিয়া অঞ্চলর একটি পোড়ো বাড়িতে।

১০ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ 'হামচুপামূহাফ'।

১১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ গঙ্গায়।

১২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ একজন পুরাতন দাসী।

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ঠাকুরবাড়ির কনিষ্ঠা বধূ।

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ বেলফুলের কুড়িগুলের মধ্যে।

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ চব্বিশ বছর।



৯.৯ আদর্শ প্রশ্নাবলি

প্রশ্ন ১ ঃ রবীন্দ্রনাথ কেন এই কাব্যসংগ্রহ গুলির প্রতি আকর্ষিত হয়েছিলেন?

প্রশ্ন ২ ঃ অক্ষয়বাবুর কাছে রবীন্দ্রনাথ কোন ইংরেজ বালক কবির কথা শুনেছিলেন, তার সাধারণ বিবরণ দাও।

প্রশ্ন ৩ ঃ প্রাচীন কাব্যকে অনুসরণ করে লেখা রবীন্দ্রনাথের সেই পঙ্‌ক্তিটি তিনি কাকে শুনিয়েছিলেন, তাতে তার প্রতিক্রিয়া কী ছিল?

প্রশ্ন ৪ ঃ ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের দেশের গীতিকাব্যকে তুলনা করে ভানুসিংহকে কে যথেষ্ট সম্মান দিয়েছিলেন?

প্রশ্ন ৫ ঃ রবীন্দ্রনাথ নিজেই কেন ভানুসিংহের কবিতার সমালোচনা করেছেন?

প্রশ্ন ৬ ঃ হিন্দুমেলা কী? এই মেলার সম্বন্ধে লেখক আমাদের কী কী জানিয়েছেন?

প্রশ্ন ৭ ঃ ভারতের 'সার্বজনীন পরিচ্ছদ' হিসেবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কী ধরণের পোষাক তৈরী করেছিলেন?

প্রশ্ন ৮ ঃ স্বাদেশিক সভার দলবলের শিকার পর্বের বর্ণনা দাও।

প্রশ্ন ৯ ঃ স্বাদেশিকতায় রাজনারায়ণ বসুর ভূমিকা আলোচনা করো।

প্রশ্ন ১০ ঃ মৃত্যুর আগে রবীন্দ্রনাথের মায়ের শারীরিক অবস্থা কেমন ছিল?

প্রশ্ন ১১ ঃ রবীন্দ্রনাথের মাতৃবিয়োগ তাঁর মনে কী রকম প্রভাব ফেলেছিল?

প্রশ্ন ১২ ঃ লেখক কখন কী ভাবে মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে উপলব্ধি করেছিলেন?

প্রশ্ন ১৩ ঃ দুঃখের মাঝে আনন্দকে কী ভাবে খুঁজতে শিখলেন রবীন্দ্রনাথ?

*** ***** ***